নোটিশ প্রদান (জলপাইগুড়ি)

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

কর্মবিরতি (পূর্বাঞ্চল)

বিশেষ ই-সংস্করণ, মার্চ ২০২৩ ■ ৫০তম বর্ষ ■ মূল্য ২ টাকা

আন্দোলন-সংগ্রামের তরঙ্গশীর্ষ থেকে

বজ্রনির্ঘোষ ঘোষণা—১০ মার্চ, ২০২৩ ধর্মঘট

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, তিন দফা দাবির ভিত্তিতে একদিনের কর্মবিরতির মধ্য দিয়ে আবার এক ঐতিহাসিক আন্দোলনে সামিল হয়েছিল রাজ্যের কর্মচারী সমাজ তথা রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নামিয়ে আনা দীর্ঘ বঞ্চনা, অবজ্ঞা ও আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজ্যের শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ কর্মচারী আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন মাইল স্টোন তৈরি করল। বকেয়া মহার্ঘভাতা সহ তিন দফা দাবিতে রাজ্যের কর্মচারী সমাজের ধারাবাহিক সংগ্রাম-আন্দোলনের একের পর এক ঢেউ সুনামির মতো

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

যখন দপ্তরে দপ্তরে আছড়ে পড়ছে, তখন কোণঠাসা হয়ে যাওয়া সরকারের পক্ষ থেকে একে দমন করার মরিয়া প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেছে। তার প্রমাণ মিলেছে, ঐদিনের কর্মবিরতির বিরুদ্ধে প্রকাশিত আদেশনামার মধ্য দিয়ে এবারেই প্রথম শুধুমাত্র ডাইসনন নয় সরাসরি ব্রেক ইন সার্ভিসের হুমকি দেওয়া হয়। কিন্তু সরকারের সমস্ত হুমকিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে সারা দিন ধরে কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ জানানোর মধ্য দিয়ে শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা তাঁদের প্রতিবাদকে প্রত্যঘাতের স্তরে নিয়ে যাওয়ার হুশিয়ারি জানালেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়।

রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ আহুত এই ২১ ফেব্রুয়ারির কর্মবিরতী কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। প্রকৃতপক্ষে রাজ্য প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীদের ক্যাডারগত সংগঠনগুলি কিছু সাধারণ দাবির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৯৫৬ সালে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি গড়ে তোলে, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠনের মধ্য থেকে আমরা প্রবেশ করি যৌথ আন্দোলনের এক নতুন ক্ষেত্রে। পরবর্তীতে ১২ই জুলাই কমিটি বা সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন গঠনের মধ্য দিয়ে এই যৌথ আন্দোলনের ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হয়। যৌথ আন্দোলনের এই ঐতিহ্য ও পরম্পরা বহন করেই বিগত এক দশকের বেশি সময় ধরে রাজ্যের সরকারের পক্ষ থেকে নামিয়ে আনা শ্রমিক-কর্মচারী বিরোধী, জন বিরোধী নীতি সমূহের বিরুদ্ধে রাজ্যের বুকে যৌথ আন্দোলনের এক নতুন প্রেক্ষিতের জন্ম দিয়েছে। বিগত বছরে

প্রদীপ বিশ্বাস

২০-২১ মে-র দু'দিন ব্যাপী গণঅবস্থান, ২৩ নভেম্বরের বিধানসভা অভিযানের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ রাজ্যের কর্মচারী সমাজের অভ্যন্তরের

"ধর্মঘট করলে সরকারী কর্মচারীদের 'ব্রেক ইন সার্ভিস' করার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের নেই"—বিশিষ্ট আইনজীবী, সাংসদ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য

এক গুণগত পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। সংগঠনের বিগত বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনে এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনরত ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক কর্মচারী সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিগত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বানে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করা দাবির ভিত্তিতে বিধানসভা অভিযান ও রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি প্রদানের কর্মসূচী যৌথ আন্দোলনের এক নতুন পথের সূচনা করে, রাজ্যে আন্দোলনরত শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের প্রত্যেকটি সংগঠন যুক্ত হয়ে লড়াই করার নতুন প্রেক্ষিত তৈরি করে। যার ফলশ্রুতিতে ঐদিনই ঘোষিত হয় ২১ ফেব্রুয়ারি সমগ্র রাজ্য জুড়ে একদিনের কর্মবিরতি পালনে আন্দোলনের কর্মসূচী।

২১ ফেব্রুয়ারির কর্মবিরতীকে রুখতে সরকার একদিকে যেমন প্রশাসনকে ব্যবহার করেছে, তেমনি সক্রিয় করেছে তার পঞ্চম বাহিনীকে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হুগলী, পশ্চিম মেদিনীপুরসহ রাজ্যের বেশ কিছু জায়গায় আন্দোলনরত কর্মচারী ও শিক্ষকেরা এদের হাতে আক্রান্ত হলেও আক্রমণ শেষ কথা বলেনি, শেষ কথা বলেছে রাজ্যের শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষকদের সাহস, ঐক্য ও দৃঢ়তা। ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলেই তারা রাজ্য প্রশাসনকে স্তব্ধ করার পাশাপাশি আগামী দিনে আন্দোলনকে আরও

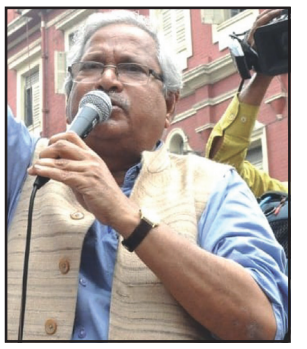
অনাদি সাহু

ঐক্যবদ্ধ ও তীব্র করার লক্ষ্যে ঐ দিনই আগামী ১০ মার্চ ২০২৩ ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়। বিগত ২৩ ফেব্রুয়ারি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। যৌথ মঞ্চের অন্য সংগঠনগুলিও স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্ট্রাইক নোটিশ দিয়েছে।

তিন দফা দাবি

- বকেয়া সহ মহার্ঘভাতা / মহার্ঘ রিলিফ প্রদান
- স্বচ্ছতার সাথে শূন্যপদে নিয়োগ ও অস্থায়ী কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ
- বিভাজনের রাজনীতি বন্ধ করে রাজ্যে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা

১৭ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা অভিযান ঃ

'সরকারী কর্মচারীরা সরকারের সম্পদ, সরকারী কর্মচারীরা কাজ করেন বলেই মানুষ সরকারী পরিষেবা পান। সরকারী প্রকল্পের সুযোগ পান। সেই সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে বঞ্চনা করছে রাজ্য সরকার। কেন সরকার বকেয়া দেবে না? টাকা নেই বলে আদালতকে বলতে গিয়েছিল সরকার, আদালত মানেনি। সরকারকে আদালত বলেছে কেন ডি.এ দিচ্ছেন না? ডি.এ কোনো দয়ার দান নয়, ডি.এ কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার। বকেয়া ডি.এ-র দাবিতে আদালতে যেমন লড়াই হচ্ছে, সেই লড়াই রাস্তাতেও করতে হবে। লড়াইয়ের তেজ এমন রাখতে হবে যাতে ডি.এ দিতে সরকার বাধ্য হয়।' ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, ১২ই জুলাই কমিটির ডাকে রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি প্রদান ও বিধানসভা অভিযান কর্মসূচীর সূচনায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার-এ উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে একথা বলেন বিশিষ্ট আইনজীবী তথা রাজ্যসভার সাংসদ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য।

শ্রমিক কর্মচারী ও শিক্ষকদের যুক্ত আন্দোলনের মঞ্চ ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বানে রাজ্য সরকারের কাছে কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া সহ ৩৫ শতাংশ মহার্ঘভাতা / মহার্ঘ রিলিফ অবিলম্বে প্রদান, সমস্ত শূন্যপদে স্বচ্ছ

সুমিত ভট্টাচার্য

পদ্ধতিতে স্থায়ী নিয়োগ, অনিয়মিত / অস্থায়ী কর্মচারী ও শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ এবং নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে সমকাজে সমবেতন, রাজ্যে গণতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুনিশ্চিত করা সহ ১০ দফা

● দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সম্পাদকীয়

১০ মার্চ ২০২৩ স্তব্ধ হবে রাজ্য প্রশাসন

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সহ রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, শ্রমিকদের প্রায় সবক'টি সংগঠন তিন দফা দাবিতে আগামী ১০ মার্চ '২৩ ধর্মঘটে সামিল হবে। মাঝে আর মাত্র কটা দিন। তারপরই স্বৈরাচারী, স্বেচ্ছাচারী শাসকের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করে প্রতিবাদে সামিল হবে রাজ্য প্রশাসনের সবক'টি অংশ। সরকারের লেজুড় বৃত্তিকারী কতিপয় কর্মচারী ছাড়া সকল অংশের কর্মচারী এই ধর্মঘটে সামিল হবেন।

ধর্মঘটের সাফল্যের ক্ষেত্রে তার প্রাক্কালে যেসব উপাদান বা অনুঘটক প্রয়োজন তার সবটাই বিরাজমান। খুব বেশি পিছনে না গিয়ে ২৩ নভেম্বর ২০২২-এর যৌথ মঞ্চের আহ্বানে বিধানসভা অভিযানে যাওয়ার কর্মসূচী থেকে যদি ধরি, তাহলে লক্ষ্য করা যাবে যে ২৩ নভেম্বর '২২ বিধানসভা অভিযান প্রবহমান সমগ্র আন্দোলনকে অত্যন্ত উঁচু সুরে বেঁধে দিয়েছিল। সেদিন ৪৭ জন কর্মচারী / পেনশনারকে গ্রেপ্তার করে একরাত লকআপে বন্দী রেখেও আন্দোলনকে দুর্বল করতে পারেনি শাসককূল। বরঞ্চ কর্মচারীদের জেদ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল শাসকের এই ঘৃণ্য আচরণে। তার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখেছিলাম ১২ই জুলাই কমিটির ডাকে ১৭ ফেব্রুয়ারি '২৩ বিধানসভা অভিযানে এবং সেই অভিযান থেকে ঘোষিত যৌথমঞ্চের ২১ ফেব্রুয়ারি সারাদিন ব্যাপী কর্মবিরতির কর্মসূচীতে। ১৭ ফেব্রুয়ারির বিধানসভা অভিযানকে ভেস্তে দিতে প্রথমে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারেই চারদিকে ব্যারিকেড করে পুলিশ প্রশাসন। কিন্তু হাজারে হাজারে কর্মচারী যখন সুনামির ঢেউ তুলে ক্রমশ আছড়ে পড়তে থাকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে, তখন বাধ্য হয়েই পুলিশ ব্যারিকেড তুলে নেয়। কর্মচারীদের এই যে প্রত্যয়ী মনোভাব তা প্রতিফলিত হয় ২১ ফেব্রুয়ারির কর্মবিরতিতেও। কর্মচারীদের এই সাহসী, দৃঢ়চেতা মনোভাব দেখে ২১ ফেব্রুয়ারি যৌথমঞ্চ সিদ্ধান্ত নেয় ১০ মার্চ প্রশাসনের সর্বস্তরে একদিনের ধর্মঘট পালনের। তার সাথে যুক্ত হয় একই দাবিতে আন্দোলনের অপর একটি অংশ। ধর্মঘটের মতো বৃহত্তর কর্মসূচীতে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়গত ও বিষয়ীগত প্রেক্ষাপট এইভাবে তৈরি হয়েছিল। কর্মচারীদের জঙ্গী, বেপরোয়া মানসিকতা এবং সংগঠনের নেতৃত্ববৃন্দের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত সহ অন্যান্য উপাদানগুলি আগামী বৃহত্তম আন্দোলনের সাফল্যের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করেছে। অবশ্যই এই ভিত্তিভূমি আরও মজবুত করেছে বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান সহ তিনদফা দাবি। এই বিষয় নিয়ে এই সংখ্যায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী এবং ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক সুমিত ভট্টাচার্য বিস্তারিত লিখেছেন। পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই।

আগামী ১০ মার্চ-এর ধর্মঘটের তিন দফা দাবির অন্তর্নিহিত মর্মবস্তু হল রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধার। সামগ্রিকভাবে রাজ্যে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং আর্থিক এবং গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে ঐক্য বিনষ্টকারী বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন লড়াই। একই সাথে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে কর্মচারী আন্দোলনের সম্পর্ক স্থাপন করতে বৃহত্তর সমাজের অন্যতম অংশ চুক্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবিকে সংযোজন করা প্রয়োজন। এটা এই সময়ের চাহিদা। ফলত এই ধর্মঘট শুধু কর্মচারীদের আর্থিক বৃদ্ধির স্বার্থে ওই ধরনের ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার, যা শাসকদলের নেতামন্ত্রীরা করছেন তা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যই শুধু নয়, কর্মচারী জনগণ ঐক্যের বিভাজন ঘটানোর ব্যর্থ প্রয়াসও বটে।

একটা কথা আছে—যার অতীত আছে, তারই ভবিষ্যৎ থাকে। খুলে বলতে গেলে যে কোনো বিষয়, সেটা ব্যক্তি বা সংগঠন যাই হোক না কেন যার ঐতিহাসিক পরম্পরা আছে, তার উপর ভিত্তি করেই তার ভবিষ্যতের জমি প্রস্তুত হয় এবং সে মাথা উঁচু করে টিঁকে থাকে। আমাদের প্রিয় সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি জন্মলগ্ন থেকেই নানাভাবে আক্রান্ত হয়েছে। অনেক নেতা-কর্মী-অনুগামীদের সাহসী সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও আত্মবলিদানের মধ্য দিয়েই এই সংগঠন কিশলয় থেকে আজ মহীরূহে পরিণত হয়েছে। এই সংগঠনের ইতিহাস হল আন্দোলন সংগ্রামের। ১০ মার্চ '২০২৩ শুধুমাত্র নিজস্ব দাবিদাওয়াতে আমরা সহ অন্যান্য সংগঠনগুলি, যাদের কর্মচারীরা রাজ্য কোষাগার থেকে বেতন পান, তারা ধর্মঘটে যাচ্ছি। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটচ্ছে। আজ থেকে প্রায় ৫৫ বছর আগে ১৯৬৮ সালের ১৬ মে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি আট দফা দাবিতে প্রথমবার ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল। সেই সময় ও পরিস্থিতি ছিল প্রতিকূল। সেইদিনের আট দফা দাবি এবং আজকের তিন দফা দাবিসনদ, এই দুটি দাবিসনদেরই মর্মবস্তু হল অর্জিত অধিকার রক্ষা। ১৯৬৮ সালের ১৬ মে ধর্মঘটের সিদ্ধান্তের পূর্বপট ছিল ২১ নভেম্বর ১৯৬৭ প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া। প্রথম যুক্তফ্রন্ট আমলে যে অধিকারগুলি অর্জিত হয়েছিল, সেদিনের ধর্মঘটের দাবিসনদে সেগুলির উল্লেখ ছিল। যেমন প্রথম বেতন কমিশন যা প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেছিল তার সুপারিশ প্রকাশ, একইভাবে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার দাবিও ছিল। ২০২৩ সালের ১০ মার্চ ধর্মঘটের দাবিসনদেও আর্থিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের প্রসঙ্গটাই কেন্দ্রবিন্দুতে আছে।

১০ মার্চ '২৩-এর ধর্মঘটের আহ্বান এসেছে আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গশীর্ষ থেকে, ২১ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত সফল কর্মবিরতির কর্মসূচীর অনিবার্য পরিণাম হিসাবেই। ১৬ মে ১৯৬৮-র ধর্মঘটের আহ্বানও একইভাবে আন্দোলনের উচ্চতম পর্যায়, ৫০ হাজার কর্মচারীর শহীদ মিনার জমায়েত থেকে এসেছিল। সেই জমায়েতে উপস্থিত ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় জননেতা কমরেড জ্যোতি বসু।

আক্রমণ সেদিনও ছিল ধর্মঘটের প্রচার পর্ব থেকে ধর্মঘট পালনের পরবর্তী পর্ব পর্যন্ত। কিন্তু রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতা-কর্মীরা ছিলেন অকুতোভয়। ধর্মঘটের পূর্বে হুমকিসূচক আদেশনামা প্রকাশ হল। যে, ধর্মঘট করলে বেতন কাটা, চাকরি ছেদ, সাসপেনশন—ইত্যাদি শাস্তি হবে। আদেশনামা বা ফতোয়ার তোয়াক্কা সেদিন করেননি ধর্মঘটীরা। ১৬ মে ১৯৬৮ প্রশাসন স্তব্ধ হয়ে গেছিল। সেদিনের আন্দোলনের ইতিহাস শিক্ষা দেয় যে শাসককে নিরস্ত্র করতে শুধু প্রতিরোধ নয়, প্রতিআক্রমণেও যেতে হয়। সেটা প্রতিআক্রমণের স্বরূপ আমরা দেখতে পাই যখন সংগঠন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে দপ্তরের কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেই দপ্তরে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই প্রতিআক্রমণের কর্মসূচীতে সাফল্যও পাওয়া গেছিল। মনে রাখতে হবে সেই সময় কর্মচারীদের ধর্মঘট তো দূরের কথা আন্দোলন সংগ্রাম করার অধিকারও প্রায় ছিল না বললে চলে।

পরিস্থিতির কখনো হুবহু পুনরাবৃত্তি হয় না। ২০১১ সালে তৃণমূল আসার পর পর থেকে রাজ্য প্রশাসনের সকল অংশের কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, শ্রমিক চূড়ান্ত প্রতিকূলতার মধ্যে আছে। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার, আর্থিক অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা সমস্ত ক্ষেত্রে আক্রমণ নামিয়ে এনেছে এই সরকার। আমাদের নেতৃত্বের উপর বদলী সহ প্রতিহিংসামূলক নানা আদেশনামা জারি করা হয়েছে। এত আক্রমণ সত্ত্বেও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভাঙা দূরের কথা, দুর্বলও করা যায়নি। যত আক্রমণ নেমেছে তত বেশি প্রতিরোধ হয়েছে। প্রতিরোধ থেকে এবার প্রত্যাঘাতে যাবার পালা। ২৩ নভেম্বর, ২০২২ বিধানসভা অভিযানে ৪৭ জন সাথীর কারাবরণ কর্মচারী আন্দোলনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। তার প্রমাণ পরবর্তী আন্দোলনগুলিতে লক্ষ্য করা গেছে। ২০২৩-২৪ বাজেট পেশের সময় চিরকুট মারফত ৩ শতাংশ মহার্ঘভাতার ঘোষণা আগুনকে দাবানলে পরিণত করেছে। তাই সময় এসেছে প্রত্যাঘাতের, প্রতিআক্রমণের। ১৯৬৮ সালের ১৬ মে প্রায় কোনো অধিকার না থাকা কর্মচারীরা যে হিম্মত দেখিয়ে পাল্টা আঘাত করেছিলেন তৎকালীন রাজ্য সরকারকে, তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আসুন ১০ মার্চ ২০২৩ সকল কর্মচারীদের নিয়ে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে, প্রশাসনকে অচল করে আমাদের পূর্বসূরীদের পরম্পরাকে উজ্জ্বলতর করি। □

৩ মার্চ, ২০২৩

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

রাজ্যপালের নিকট স্মারকলিপি প্রদান

দাবিতে একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নয়া পেনশন ব্যবস্থা (এম পি এস) বাতিল করে পুরোনো পেনশন ব্যবস্থা (ওপিএস) পুনরায় চালু করা, কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরের বাণিজ্যিকীকরণ, বেসরকারীকরণ করা বন্ধ করা, কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত সমগ্র প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদগুলিতে স্থায়ী নিয়োগ করতে হবে। রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে বিনষ্ট করা চলবে না সহ ১৭ দফা দাবিতে রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি প্রদানের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে একই সাথে দাবি উত্থাপন ও বিধানসভা অভিযান কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে জনপ্লাবন সৃষ্টি হয় গোটা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার চত্বর জুড়ে। অভিযান কর্মসূচীকে বানচাল করতে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্টীলের ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তার দু'প্রান্ত এমনকি গলিপথও রুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু জমায়েতের বিশালতায় এবং বিধানসভা অভিযানকারীদের মেজাজ লক্ষ্য করে অভিযানের অভিমুখের স্টীলের ব্যারিকেড খুলে ফেলা হয় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পরবর্তীতে বডি পোস্টার পরিহিত, প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন, লাল পতাকায় সুসজ্জিত দৃপ্ত মিছিল বিধানসভা অভিমুখে অভিযান শুরু করে। ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সুমিত ভট্টাচার্য পরিস্থিতি অনুধাবন করেই অভিযানে অংশগ্রহণকারী সকলের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান, কোনোরকম প্ররোচনায় পা না দিয়ে ব্যারিকেডের এপারেই সকলকে রাজপথে বসে যেতে। একই সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, কোনোরকম প্ররোচনা সৃষ্টি না করার, কারণ জমায়েতের যে মেজাজ রয়েছে তাতে এ ব্যারিকেড ভাঙতে বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ সংগঠন হিসেবে ১২ই জুলাই কমিটি কখনোই কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় না। তাই রাজপথেই এই অবস্থান চলবে। অবস্থান কর্মসূচী শুরু হওয়ার পরবর্তীতে বিধানসভা অভিযান কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে সি আই টি ইউ রাজ্য সম্পাদক অনাদি সাহু বলেন, এই রাজ্য সরকার চোরেদের নিরাপত্তা দেয়। কর্মচারীদের নিরাপত্তা, তাঁদের ন্যায্য অধিকার চাইতে গেলে কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন 'ঘেউ ঘেউ করবেন না'। সরকার বলছে টাকা নেই, এদিকে দেদার টাকা উৎসব, কার্নিভালে খরচ করছে। অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের সামান্য ভাতা দিয়ে খাটিয়ে নেওয়া হচ্ছে, তাদের কোনো সামাজিক সুরক্ষা নেই। সরকারী দপ্তরগুলিতে প্রচুর শূন্যপদ পড়ে রয়েছে। নিয়োগ করা হচ্ছে না, আর নিয়োগ করতে গেলেই দুর্নীতি প্রকাশ্যে চলে আসছে। শিক্ষক নিয়োগ, কনস্টেবল নিয়োগ, গ্রুপ ডি পদে নিয়োগ, নার্সদের নিয়োগ যা নিয়োগ হয়েছে সবটাতেই দুর্নীতি হয়েছে। টাকা দিয়ে চাকরি দেওয়া হয়েছে। এই সরকারকে উৎখাত করতে আরও বৃহত্তর লড়াইয়ে সামিল হওয়ার জন্য তিনি উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান। পরবর্তীতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন শুধু ডি.এ নয়, সরকারী দপ্তরের শূন্যপদে স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগের দাবির লড়াই, সমকাজে সমবেতনের লড়াই, চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের স্থায়ীকরণের দাবির লড়াই সহ রাজ্যে গণতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুনিশ্চিত করার লড়াইকে আরও তীব্র করতে হবে। স্বেচ্ছাচারী সরকার যা করবে, কর্মচারীরা মুখ বুজে তা মেনে নেবে এটা যদি সরকার মনে করে তাহলে ভুল হবে। বিগত ২৩ নভেম্বর যৌথ মঞ্চের আহ্বানে বিধানসভা অভিযান কর্মসূচীতে ৪৭ জনকে লকআপে ভরে সরকার ভেবেছিল কর্মচারী আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবে। কিন্তু পরের দিন কর্মচারী আন্দোলনের চাপে ৪৭ জনকেই শর্তাধীন জামিন, পরবর্তীতে নিঃশর্ত জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত। আজকের জমায়েত প্রমাণ করেছে কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী সহ রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্তদের আন্দোলন আরও ঐক্যবদ্ধে প্রসারিত হয়েছে। আগামীদিনে এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন আরও প্রসারিত হবে। তারই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের দিন গোটা রাজ্যের সমস্ত সরকারী দপ্তরে কর্মবিরতি প্রতিপালন করা হবে। তাতেও যদি সরকারের হুঁশ না ফেরে তাহলে আরও বৃহত্তর কর্মসূচী গ্রহণ করতে বাধ্য হবে রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত ২৮টি সংগঠনের যৌথ মঞ্চ। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সুমিত ভট্টাচার্য বলেন মূলত মহার্ঘভাতা সহ আরও কয়েকটি জরুরি দাবি নিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, এবিটিএ, এবিপিটিএ সহ আরও কয়েকটি সংগঠন যৌথ মঞ্চ গড়ে তুলে ধারাবাহিক আন্দোলন। বিকাশভবন অভিযান, বিধানসভা অভিযান, কর্মবিরতি ও ধর্মঘটের মতো কর্মসূচী প্রতিপালন করেছেন। রাজ্য সরকার বল প্রয়োগ করে ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে দমন করতে চেয়েছে প্রতিবাদ আন্দোলন, কিন্তু পারেনি। প্রশাসনিক আক্রমণের ভয়ে গুটিয়ে ছিলেন, ধারাবাহিক আন্দোলনের উত্তাপে তারাও সাহস সঞ্চয় করেছেন, আন্দোলনের পথে নেমেছেন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই আন্দোলনের বৃত্তও প্রসারিত হচ্ছে। একাধিক কেন্দ্রও তৈরি হচ্ছে। পরিস্থিতিও এই একাধিক কেন্দ্রকে এক জায়গায় এনে বৃহত্তর পরিসরে আন্দোলনের বাস্তবতা তৈরি করেছে। মহার্ঘভাতার মতোই আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি হল নয়া পেনশন প্রকল্প বাতিলের দাবি, যা কেন্দ্রীয় সরকারের বিচার্য বিষয়। ২০০৪ সালে বাজপেয়ী সরকারের শাসনকালে এই প্রকল্প চালু হয়। পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার এই প্রকল্প চালু করতে অস্বীকার করে। কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যের কর্মচারীরা যারা এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে যারা অবসর গ্রহণ করেছেন তাঁরা অবসরকালীন সময়ে পেনশন হিসাবে যা হাতে পাচ্ছেন তার পরিমাণ পুরনো ব্যবস্থায় প্রাপ্য পেনশনের ভগ্নাংশ মাত্র। স্বাভাবিকভাবেই ২০০৪ সাল থেকে এই প্রকল্প বাতিলের দাবিতে যে লড়াই শুরু হয়েছিল তা আরও তীব্র হয়েছে। এমনকি বেশ কয়েকটি রাজ্য সরকারও পুরনো ব্যবস্থায় ফিরে যেতে চাইছে। স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্য সরকারের কাছে উত্থাপিত দাবি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উত্থাপিত দাবি নিয়ে আজকে রাজ্যপালের নিকট স্মারকলিপি উত্থাপন করা হয়েছে। রাজ্য সরকার যদি মনে করে ৩ শতাংশ ডি.এ দিয়ে কর্মচারীদের চুপ করাবে তবে ভুল হবে। ভিক্ষার দানের বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারীরা জবাব দিতে প্রস্তুত হচ্ছে। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি কর্মবিরতিতে রাজ্য সরকারী দপ্তরগুলিতে কোনো কাজ হবে না। আগামী আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত থাকুক সরকার। এদিনের সমাবেশে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বি ই এফ আই-র পক্ষে প্রদীপ বিশ্বাস, কর্মচারী আন্দোলনের নেতা সঙ্কেত চক্রবর্তী, তাপস ত্রিপাঠী প্রমুখ। এদিনের জমায়েতে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলী ও নদীয়া জেলার একাংশ থেকে ২০ হাজারের বেশি অভিযানকারী দীর্ঘ ২ ঘণ্টার বেশি এস এন ব্যানার্জী রোড সহ লেনিন সরনীর একাংশে অবরুদ্ধ করে রাখে। পরবর্তীতে ২১ ফেব্রুয়ারি সারাদিনের কর্মবিরতির আহ্বানের মধ্য দিয়ে অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সুমিত ভট্টাচার্য। বিধানসভা অভিযানে অংশগ্রহণকারী জেলাগুলো ছাড়া রাজ্যের সমস্ত জেলাগুলোতে এদিন বেলা ২টা-৪.৩০টা পর্যন্ত জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ ও জেলা শাসককে স্মারকলিপির অনুলিপি প্রদানের কর্মসূচী বিপুল জমায়েতের মধ্য দিয়ে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। □

সুমন কান্তি নাগ, দেবাশীষ রায়

কর্মবিরতি

পূর্ব বর্ধমান

নবমহাকরণ অঞ্চল

পুরুলিয়া

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

১০ মার্চ, ২০২৩ ধর্মঘট

ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই পারে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী
(সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি)

সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। তবে তা একই অবস্থায় ঘটে না। অবস্থানগত দিক থেকে আরও উন্নত পর্যায়ে ঘটে। দীর্ঘ সংগ্রাম-আন্দোলনে ধারাবাহিক যুক্ত থাকার মধ্য দিয়ে ১৯৬৮ সালের ১৬ মে রাজ্যের কর্মচারীরা নিজস্ব দাবি অর্জনের লক্ষ্যে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিলেন। দীর্ঘ পাঁচ দশকের অধিক সময় অতিক্রম করে পুনরায় নিজস্ব দাবিতে ধর্মঘট। মধ্যবর্তী সময়ে বহুমুখী সংগ্রাম-আন্দোলন, কখনও অনুকূল, আবার কখনও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে। অতীতে নিজস্ব দাবিতে ধর্মঘটে অংশগ্রহণের জন্য কোনো আইনী স্বীকৃতি ছিল না। পরবর্তীতে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কর্মচারীদের আইনী অধিকার স্বীকৃত হয়। বর্তমানে ধর্মঘট করার স্বীকৃত আইনী অধিকার বলে এই হাতিয়ারকে ব্যবহার করা। এই গুণগত উন্নতমাত্রা যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি প্রতিবন্ধকতার দিক—অতীতে শত্রুকে চিহ্নিত করা যেত, কারণ সে দৃশ্যমান ছিল। বর্তমানে শত্রু বহুমাত্রিক রূপ নিয়ে হাজির হয়েছে। ফলে শত্রু চিহ্নিতকরণে নানান বিভ্রান্তি থাকছে। তবে ইতিহাসের অমোঘ শিক্ষা, ধারাবাহিক সংগ্রাম থেকে উচ্চতর সংগ্রামে উত্তোরণের স্তরেই শত্রুকে চিহ্নিতকরণের কাজ সহজ হয়।

এই নতুন ইতিহাস রচনার দিকে এগিয়ে চলেছে রাজ্যের মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমাজ। রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা রাজ্য সরকারের আর্থিক বঞ্চনার প্রতিবাদে বৃহত্তর ঐক্যের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ১০ মার্চ, ২০২৩ প্রশাসনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে সরকারকে 'আলটিমেটাম' দেওয়া। রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের যৌথ মঞ্চের পক্ষে বহুদিন ধরেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দাবিতে ধারাবাহিক আন্দোলন করা হয়েছে। কিন্তু মন্ত্রিসভা বা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এমন সুযোগ পাওয়াটা সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত হলেও রাজ্য প্রশাসনের বর্তমান পরিচালন পদ্ধতি প্রত্যাশিত স্পেসটুকুও দেয়নি। কিন্তু তা বলে আমরা নিষ্ক্রিয়, চুপচাপ বসে থাকতে পারি না। আমাদের ধারাবাহিক আন্দোলন জারি রাখতে হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকারের এই নেতিবাচক মনোভাবকে 'উদাসীনতা' না বলে 'উপেক্ষা' বলাই শ্রেয়। কারণ উদাসীনতা সবসময় পরিকল্পনা অনুযায়ী হয় না। কিন্তু উপেক্ষার পেছনে সবসময়েই একটা পরিকল্পনার ছাপ থাকে। অথচ প্রশাসন চলছে কর্মচারীদের সাহায্যেই। সরকার চাইলেও কর্মচারীদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া জনগণের 'দুয়ার'-এ পৌঁছাতে পারে না। আমাদের অপরাপর অংশ শিক্ষক মহাশয়রা, যারা সমাজ গড়ার কারিগর যাদের শ্রম ও মেধা ছাড়া সভ্যসমাজ গড়ে উঠতে পারে না। প্রশাসনের শীর্ষবিন্দু থেকে নিম্নতম স্থান পর্যন্ত যাঁরা জড়িয়ে রয়েছেন (স্থায়ী বা অস্থায়ী), তাঁরা সকলেই কম-বেশি যে যোগ্যতা সাথে নিয়ে এসেছেন, তা তো তৈরি করে দিয়েছেন মাস্টারমশাইরাই। সমাজ গঠনের কারিগররাও সমানভাবে উপেক্ষিত। আমরা কখনোই জনগণের স্বার্থব্যতিরেকে বিচ্ছিন্নভাবে শুধুমাত্র নিজস্ব ক্ষেত্রের দাবি নিয়ে আন্দোলন করিনি। বরং তিন দফা বিশেষ করে শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ, গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও সম্প্রীতি রক্ষার দাবি পূরণ হলে তা জনগণের পক্ষেও ভালো। আমরা প্রতিদিন সরকার, রাজ্যবাসী সবার জন্যই আবশ্যিক কাজ করছি, আমার দাবি উত্থাপনের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে চলেছি। অথচ সরকার যেন পণ করেছে যে, রাজ্য কোষাগার থেকে বেতন পাওয়া কারও কথাই তারা শুনবেন না। নিজেদের মর্জিমতো 'চিরকুট'-এ লিখে ভিক্ষা দান করবেন। তাই, আমরাও শপথ গ্রহণ করেছি কোনো ভিক্ষার দান নয়, হকের দাবি বুঝে নিতে আন্দোলনের মধ্যবর্তী ধাপ 'সারা দিন ব্যাপী' কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ সভা' থেকে পরবর্তী সর্বোচ্চ ধাপ ধর্মঘটের মাধ্যমে আরও জোরে ধাক্কা মারতে হবে। ধর্মঘটের মাধ্যমে প্রশাসনের চাকা যাতে সম্পূর্ণ থেমে যায়, এমনভাবে প্রস্তুতি নিয়েই আমাদের নামতে হবে।

মধ্যবিত্ত সুবিধাভোগী কর্মচারী। তারা আবার কিভাবে ধর্মঘট করবে!—এই ধরনের প্রচার চালিয়ে মানসিক দৃঢ়তাকে ভেঙ্গে দেওয়ার নানা অপকৌশল বিভিন্নভাবে চলে। কিন্তু মনে রাখা দরকার শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সমাজ উত্তরণের কালপর্বে আন্দোলন-সংগ্রামে কর্মচারীসমাজের ভূমিকা বারে বারে প্রমাণিত। যদিও, রাষ্ট্রব্যবস্থা শুরুর সময় থেকে দেশি-বিদেশি উভয় শাসকের অধীনে কর্মরত কর্মচারী হিসাবে রাজকর্মচারীদের বিভিন্ন সময় ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়বিধ ভূমিকা সকলেরই জানা। দেশি-বিদেশি শাসক বা রাজঅনুগ্রহের পক্ষ থেকে সুবিধা ভোগ, আবার বিপরীত মেরুতে অবস্থান গ্রহণের জন্য রাজরোষের মুখোমুখি হয়েছে। যতদিন রাজন্যবর্গ বা প্রশাসকের স্বার্থরক্ষা হয়েছে, ততদিন রাজকর্মচারীকে ব্যবহার করা হয়েছে। যখন স্বার্থ ফুরিয়েছে বা স্বার্থের বিঘ্ন ঘটেছে কর্মচারীকে আক্রমণ করা হয়েছে—এমন বহু ঘটনাবলী ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের বহু কর্মচারীর জীবনেও এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি এখনও ঘটে চলেছে। কিছু অংশের কর্মচারী নানান বিভ্রান্তিকর উপাদানের সম্মুখীন হয়ে নিজের অবস্থান স্থির করতে দ্বিধাগ্রস্ত। উল্টোদিকে আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে অধিকাংশ শ্রমিক-কর্মচারী লড়াই জারি রেখেছে।

দেশের শ্রমজীবী আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ রাজ্য সরকারী কর্মচারীসমাজ। আবার সমাজ দর্শনের অমোঘ সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করানোর চেতনায়, তাঁদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা চলেছে সংগঠনের প্রতিটি কাঠামোর মধ্য থেকে। সরকারী কর্মচারীদের উপর শোষণ, বঞ্চনা, দমন-পীড়নের শ্বাসরোধকারী পরিবেশের পরিবর্তন ঘটানোর জন্য প্রয়োজন হয় যৌথ আন্দোলনের। গঠিত হয় রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের একটি যৌথ মঞ্চ—রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। সেই যৌথ মঞ্চের নেতৃত্বে কর্মচারীরা প্রাপ্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এবং নিজ আত্মসম্মান-আত্মমর্যাদা তুলে ধরার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক সংগ্রাম-আন্দোলন গড়ে তোলে, যার ধারাবাহিকতা এখনও বর্তমান। এই ধারাবাহিক সংগ্রাম-আন্দোলন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, অর্থনৈতিক দাবিতে সংগ্রামের মধ্যেই সাধারণ মানুষের সাথে কর্মচারীদের আন্দোলনের মেলবন্ধন ঘটে, যার ফলে কর্মচারীসমাজের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে। ধারাবাহিক সংগ্রামের মধ্য দিয়েই প্রাথমিক চেতনা, গণতান্ত্রিক চেতনায় সর্বোপরি অধিকারবোধের চেতনায় উন্নীত হয়।

রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও অন্যান্য সংগঠিত-অসংগঠিত অংশের শ্রমজীবী মানুষের লড়াইয়ের ক্ষেত্র আলাদা, কিন্তু অভিমুখ অভিন্ন। শ্রমজীবী মানুষের লড়াই-আন্দোলনে বিভ্রান্তির বীজ বপন করতে, তাদের খণ্ড খণ্ড রূপ দিতে প্রতিপক্ষের প্রয়াসের বাইরে নয় কর্মচারীসমাজও। বিগত ৬০-৭০ দশকের আন্দোলনকেও অনেক প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে আক্রমণের বহুমাত্রিকতার মধ্য দিয়ে পথ পরিক্রমা চলছে। তিন দশকের বেশি সময় ধরে পুঁজিবাদ বেপরোয়া। ফলে লড়াই-সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত অধিকার হরণ করে মুনাফাকে স্ফীত করছে। আরও মুনাফার লোভে রাষ্ট্রের কল্যাণকামী ভূমিকাকে খর্ব করা হচ্ছে। নিয়মিত সংগঠিত অংশের পরিবর্তে চুক্তি-এজেন্সি-আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে কাজ চলছে। একতরফাভাবে শ্রম আইন সংশোধনের নামে চারটি শ্রম কোডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকারকে খর্ব করা।

এর বিরুদ্ধে যাদের প্রতিবাদ প্রতিরোধে সোচ্চারিত হওয়ার কথা তাদের একটা অংশ (সংখ্যায় কম হলেও) সাময়িক বিভ্রান্তিতে বিশ্বায়িত ব্যবস্থার সমর্থক হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ শ্রেণীঅবস্থানকে ভুলে গিয়ে সমঝোতা করতেই অভ্যস্ত। একদিকে উগ্র দক্ষিণপন্থী-উগ্র জাতীয়তাবাদী-উগ্র ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা জনমোহিনী শ্লোগান দিয়ে নিজেদের অনুকূলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। আবার, প্রচারের মুখোশে মুখ ঢেকে উন্নয়নের মেকীত্ব তৈরি করে বেড়াচ্ছে। অথচ মানুষের প্রকৃত মৌলিক চাহিদা পূরণ না হওয়া আক্রান্ত-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ প্রকৃত বিকল্প না পেয়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন। একদিকে উন্নয়ন তত্ত্বের পাশাপাশি নীচের স্তরে প্রতিনিয়ত হিংস্রতার প্রকাশ পাচ্ছে, আবার উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা শক্তি বৃদ্ধি করতে সবরকম সহায়তা পাচ্ছে। স্বভাবতই শ্রমজীবীদের আন্দোলনমুখরিত সংহতি আজ আক্রান্ত। কিন্তু আন্দোলন-সংগ্রামের বাস্তবতা হারিয়ে যায়নি। বরং অনেক বেশি সম্ভাবনা প্রতিদিন বিকশিত হচ্ছে। বিকশিত হচ্ছে লড়াই-আন্দোলনের নতুন নতুন ক্ষেত্র। যে কৃষকসমাজ অর্থনৈতিক শোষণের জালে জর্জরিত হয়ে আত্মহত্যাই একমাত্র পথ হিসাবে মনোস্থির করেছিল, তারা আজ প্রতিরোধের রাস্তাকেই একমাত্র পথ হিসাবে বেছে নিয়েছে এবং দাবি আদায়ে সমর্থ হচ্ছে। রাজ্যেও প্রায় সমস্ত অংশের শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুব-মহিলারা নিজস্ব দাবি আদায়ে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে সামিল হচ্ছে।

কর্মচারীদের প্রতি রাজ্য সরকারের বঞ্চনা চূড়ান্ত জায়গায় চলে গেছে। শুধু আর্থিক বঞ্চনাই নয়, আর্থিক প্রবঞ্চনার সাথে সাথে সমগ্র কর্মচারীসমাজের প্রতি অধিকার ও মর্যাদার উপর আক্রমণ নামিয়ে আনছে। শূন্যপদে নিয়োগ বন্ধ করা ছাড়াও দলীয় ও আর্থিক স্বার্থকে বিবেচনায় রেখে খেয়ালখুশিমতো বেপরোয়াভাবে আংশিক ও অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। প্রশাসনিক দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে পিএসসি-র মাধ্যমে নিয়োগের যে প্রথা এতাবৎকাল বজায় ছিল, দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে ও দানবীয় স্বার্থে তাকেও পঙ্গু করা হচ্ছে। আবার, শুধু আর্থিক বা অধিকারগত বঞ্চনাই নয়, কর্মচারীদের প্রতি সরকারের তীব্র অপমানজনক মনোভাবের প্রতিফলন বারে বারে প্রকাশিত হচ্ছে। ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করলে 'ডায়াসনন' বা বেতন কাটা হচ্ছে, অথচ কারণে-অকারণে ছুটি দিয়ে কর্মচারীদের সচেতন ঐক্যের বিপরীতে ধর্মীয় অনুভূতি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। পাশাপাশি

কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত দাবিতে সংগ্রামকে রুখতে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকছে না। প্রশাসনিক আক্রমণের শিকার কর্মচারীরা। প্রতিহিংসাপরায়ণ বদলি ইত্যাদি আক্রমণ চলছে। কর্মচারীদের চাকরিজীবনে ছুটির সুযোগ-সুবিধাকে উপেক্ষা করে নিজস্ব পাওনা ছুটি নেওয়ার ক্ষেত্রেও চলছে চরম অগণতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে প্রশাসনকে চিঠি দিলে উত্তর দেওয়া দূরের কথা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সরাসরি তা অগ্রাহ্য করে সংগঠনগুলির প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করছেন। অথচ সরকারের প্রাণশক্তি হিসাবে কর্মচারীরাই কাজ করে চলেছেন। ম্যাজিসিয়ান না হয়েও বিপুল পরিমাণ মহার্ঘভাতা 'ভ্যানিস' করে ষষ্ঠ বেতন কমিশন লাগু করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা পাওয়ার অধিকার, যে অধিকার দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছিল, তা আজ আক্রান্ত। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সমকাজে সমবেতন হিসাবে ন্যূনতম বেতন নির্ধারিত হয়েছিল ১৮,০০০ টাকা (যদিও বর্তমান বাজারমূল্যের নিরিখে ২১,০০০ টাকা)। তা মান্যতা না দিয়ে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ন্যূনতম মাসিক বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭,০০০ টাকা। অসংগঠিত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই ন্যূনতম মাপকাঠিও কার্যকরি হয়নি। এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে আমাদেরই গর্জে উঠতে হবে।

বর্তমান সময়ে প্রয়োজন প্রতিবাদী রূপের পুনরুত্থান ঘটানো, যা আস্তে আস্তে বিকশিত হচ্ছে। প্রতিনিয়ত আন্দোলনের সাফল্যের বৃত্ত প্রসারিত হচ্ছে। বিধানসভা অভিযান ও বিক্ষোভ সমাবেশের কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শান্তিপূর্ণ পথে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ২৩ নভেম্বর, ২০২২ কর্মসূচীতে বিপুল কর্মচারী জমায়েতে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে কর্মচারীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে আটকানোর চেষ্টা করে। পুলিশী বাধায় দাবি আদায়ে নাছোড় কর্মচারীরা ব্যারিকেডের বাধাকে জয় করে বিধানসভার সামনে উপস্থিত হয়ে এই বার্তাই দিয়েছে—বঞ্চনা আর অবজ্ঞার অবসানে যে কোনো লড়াই-আন্দোলনেই তারা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পাশে আছে। কোনো ধরনের হুমকি বা ভয়ের কাছে মাথানত না করে দাবি আদায়ে প্রয়োজনে প্রশাসনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার দৃঢ়প্রত্যয় ঘোষণা করে। এখন এই প্রত্যয়কে কার্যকরী করতে নিজের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং কর্মচারীদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে। ২৪-২৬ ডিসেম্বর ২০২২ অনুষ্ঠিত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন বার্তা দিয়েছে—প্রতিবাদের ভাষাকে প্রতিরোধে উন্নীত করেই গণতন্ত্রকে রক্ষা, ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্যকে রক্ষা, সর্বোপরি জীবন-জীবিকার উপর অসহনীয় আক্রমণের মোকাবিলা করা সম্ভব। এই লড়াই একা ব্যক্তিবিশেষের নয়, সমষ্টির। কর্মচারীদের সাথে নিরন্তর যোগাযোগের মাধ্যমে তাদেরকে আন্দোলন-সংগ্রামে সামিল করার মাধ্যমেই তা সম্ভব। তবে কর্মচারীদের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষার প্রশ্নে আগের পরিস্থিতি নেই। প্রয়োজন সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে নিজের কর্মীসত্ত্বা নিয়ে কর্মচারীর সামনে হাজির হওয়া। রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে, প্রতিটি ইউনিটে কর্মচারীর সাথে সাংগঠনিক ভাবনার মতবিনিময় করা। একদিকে সাংগঠনিক কাঠামোকে সক্রিয় করা, অপরদিকে কর্মচারীদের আন্দোলনমুখীন করে তোলা। কিছুটা আত্মচিন্তা, কিছুটা নিস্পৃহতা, কিছুটা ভীতির পরিবেশ ইত্যাদি বাস্তবতার মধ্যেও নিজেদের এ থেকে মুক্ত করতে হবে। প্রয়োজন নিজের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটানো। আমরা জানি বিশ্বায়নের আক্রমণ সর্বগ্রাসী। আজকে তার বিভিন্ন রূপ আমাদের কাছে পরিস্ফুট হচ্ছে। অর্থনৈতিক-সামাজিক- সাংস্কৃতিক সবদিক দিয়েই আক্রমণ আসছে। লক্ষ্য—মুনাফা, আরও মুনাফা। সেইজন্যই শ্রম আইন সংস্কারের নামে খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিবাদের কণ্ঠকে চেপে ধরা। কিন্তু প্রতিবাদে সামিল দেশের শ্রমিকশ্রেণী। বেসরকারীকরণ কোরো না—এই আবেদন-নিবেদনের জায়গায় আর দেশের শ্রমিকরা নেই। এখন শ্রমিকদের মেজাজ হল বেসরকারীকরণ বন্ধ করে দেওয়ার মেজাজ। ধর্মঘট প্রতিরোধের জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে, সরকার যদি ধর্মঘটকে বেআইনি বলে, তাহলে আইন ভেঙে স্ট্রাইক করে বেসরকারীকরণ রোখা হবে। নতুন ধারায় প্রবেশ করেছে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। সেই আন্দোলনের রাস্তা থেকে মানুষকে ঘুরিয়ে দিতেই বিভাজনের রাজনীতি করছে দেশ ও রাজ্যের শাসকদল। দেশের সংবিধানকে আক্রমণ করে এই ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত থাকছে শাসককুল। এইসব বিষয়ে প্রতিনিয়ত নিজেকে জাগ্রত রেখেই বিনম্রভাবে সকলের কাছে পৌঁছাতে হবে। ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী শোনাই শুধু কাজ নয়, উদ্ভূত অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে কর্মচারীকে দিশা দেখানো, সচেতন করে আন্দোলনমুখী করে তোলা অন্যতম কাজ। কাজের পূর্ণতা পাবে তখনই, যখন সমস্ত ভয়-ভীতি, সংশয় কাটিয়ে সহমতে আনা কর্মচারীকে আন্দোলনের রাস্তায় আনতে পারা যাবে। এটা সম্ভব যদি আমি নিজেই প্রয়োজনীয় গুণাবলী অর্জন করে কর্মচারীর কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করতে পারি—যার চেষ্টায় হাজার হাজার কর্মী-নেতৃত্ব সচেষ্ট রয়েছেন।

স্মরণে রাখা প্রয়োজন, অধিকার প্রতিষ্ঠায় সম্মেলনের মঞ্চ থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত রূপায়ণের জন্য একটি বা দুটি কর্মসূচীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না। লাগাতার কর্মসূচীর মধ্যে আমাদের থাকতে হবে। শ্রমিক-কর্মচারীদের শ্রেণীসংগ্রাম হল দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম, যা সবসময় সরলরেখা ধরে চলে না। যে কোনো নেতিবাচক পরিস্থিতির অভ্যন্তরেই নিহিত থাকে সম্ভাবনার বীজ। স্বৈরাচারীরা ক্ষমতার ঔদ্ধত্যে স্বেচ্ছাচার ডেকে আনে, যা ইতিহাসে বারে বারে প্রমাণিত। স্বৈরাচারের লক্ষ্যই হল নিজের স্বার্থে বিরোধীদের দখল করতে ক্রমশঃ আরও স্বৈরাচারীতে পরিণত হওয়া। মুখে গণতন্ত্রের বুলি আওড়ালেও আস্তে আস্তে তারা দাঁত-নখ বার করে প্রকৃত রূপ প্রকাশ করে। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য সমস্ত উপাঙ্গকেই নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। কিন্তু গণতন্ত্র বড়ই নির্মম। সে তার পথ বের করে নেয়। তাই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণ ছাড়া বিকল্প পথ নেই। আত্মসমর্পণ নয়, প্রতিরোধের জন্য মাথা তুলতে হবে আমাদেরকেই। পরিবার-পরিজন সহ কর্মচারীসমাজের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রতিপালনের মহান দায়িত্বের ঐতিহ্য বহন করে চলেছি আমরা। জনগণের আন্দোলনের সাথে কর্মচারীদের আন্দোলনের ঐক্যের বন্ধন ঘটাতে চাই জনজীবনের দাবি নিয়ে লড়াই। বৃত্তের পরিসর বৃদ্ধি করে বৃহত্তর লড়াইয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। ক্ষোভের শুধুমাত্র পরিমাণগত বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই নয়, প্রসারও ঘটছে। কর্মচারী ও শিক্ষকদের প্রায় সকলেই এখন ক্ষোভের তরণীতে সামিল হয়েছেন স্বৈরাচার আর মিথ্যাচারের বেসুরো যুগলবন্দীকে ভাঙার জন্য। এই ক্ষোভের তরণীতে সওয়ার হয়ে সংগ্রামের ময়দানে যারা এগিয়ে আসছে তাদের নিয়ে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলা—এটা সময়ের দাবি। সাথী হিসাবে যুক্ত করা প্রশাসনের অভ্যন্তরে থাকা অনিয়মিত কর্মচারীদের। নবজাগরণের উত্তরসূরী মধ্যবিত্ত কর্মচারী ও শিক্ষকরা জানান দিক তারা মেরুদণ্ড বন্ধ রাখেনি। রাখতে শেখেনি। ১০ মার্চ ২০২৩ সর্বাত্মক ধর্মঘট করে সেটা জানান দেওয়ার দিন। □

Editor : MANAS KUMAR BARUA
SANGRAMI HATIAR
State Co-ordination Committee
50th Year, Special E-Eidtion, March 2023
Regd. No. : 18484/71

১০ মার্চ, ২০২৩ ধর্মঘট

দাবি ও আন্দোলন কখনও পরিস্থিতি নিরপেক্ষ নয়

সুমিত ভট্টাচার্য
(যুগ্ম আহ্বায়ক, ১২ই জুলাই কমিটি)

শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম-আন্দোলনের 'ফর্ম' ও 'কনটেন্ট' দুটোই নির্ভর করে পরিস্থিতির ওপর। 'কনটেন্ট' অর্থাৎ কোন কোন বিষয় আন্দোলন সংগ্রামে অগ্রাধিকার পাবে, বা দাবি সনদে কোন কোন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, তা যেমন সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে, তেমনই ঐ দাবি সনদ নিয়ে গড়ে ওঠা আন্দোলন-সংগ্রামের ফর্মও ঠিক করে দেয় ঐ সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিই। আন্দোলন-সংগ্রাম কতখানি কার্যকরী হবে বা লক্ষ্যে পৌঁছোতে সক্ষম হবে কিনা তা নির্ভর করে সঠিক 'ফর্ম' নির্বাচন করা এবং তাকে রূপায়ণ করার ওপর। 'কনটেন্ট' নির্বাচন যতই নিখুঁত হোক না কেন, 'ফর্ম' নির্বাচনে ভ্রান্তি সংগ্রাম আন্দোলনকে দিশাহীন করে দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, স্বাধীনতা-উত্তর সাত দশকে রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলন, তথা মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলন পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী ফর্ম নির্বাচন করে এগোতে পেরেছে। পেরেছে বলেই, একদিকে একের পর এক লক্ষ্যপূরণে সক্ষম হয়েছে। অপরদিকে বহমান গণআন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ শরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।

এই নিবন্ধে মূলত পরিস্থিতির পরিবর্তনকে অনুধাবন করে ফর্ম নির্বাচনের যে মুন্সিয়ানা এই রাজ্যের মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলন দেখিয়েছে, তা নিয়েই আলোচনা করা হবে। কিন্তু সেই আলোচনা শুরু করার আগে পরিস্থিতি কিভাবে কনটেন্ট বা বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে দেয়, তা নিয়ে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলে নেওয়া ভালো, সমগ্র আলোচনাটির (ফর্ম ও কনটেন্ট উভয়তই) কেন্দ্রে থাকবে সমাজ সচেতন মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলন তথা রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলন। সমাজ-উদাসীন আন্দোলনের ধারাও নির্দিষ্ট পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত কারণেই জন্মলাভ করে, কখনও কখনও খরস্রোতা আকারও নেয়, আবার পরিস্থিতির জটিল অঙ্ক ঠিকমতো সমাধান করতে না পেরে মুখ থুবড়েও পড়ে। রেফারেন্সের প্রয়োজনে এই নিয়ে দু-একটি কথা হয়তো বা বলতে হবে, কিন্তু নিবন্ধের আকার সীমিত রাখার জন্য বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ না করাই শ্রেয়।

(এক)

কনটেন্ট বা বিষয়বস্তু নিয়ে দু-একটি কথা বলার জন্য আমরা বর্তমান সময়ে মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনের দাবি সনদে পাকাপাকি জায়গা করে নেওয়া কয়েকটি বিষয়কে বেছে নিতে পারি। যেমন 'নয়া পেনশন স্কীম' বাতিল করার দাবি। নয়া পেনশন স্কীমের মূল কথা হল, পেনশন ব্যবস্থার বেসরকারীকরণ, সরকারের পেনশন প্রদানের দায় থেকে অব্যহতি এবং এই অবসরকালীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাটিকে শেয়ার মার্কেটের সাথে জুড়ে দেওয়া।

গত শতাব্দীর নব্বই-এর দশকের আগে, এই ধরনের দাবি যে দাবিসনদে যুক্ত হতে পারে, এমন কথা সেইসময়ের কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ভাবতেই পারেননি। কারণ রাষ্ট্র তখন জনকল্যাণকামী। ফলে পেনশনের দায় থেকে হাত ধুয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত সেই সময় কেন্দ্র বা রাজ্য কোনো স্তরের সরকারই গ্রহণ করেনি। কিন্তু নব্বই দশকের একেবারে গোড়া থেকে যে নয়া উদারবাদী সংস্কার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হল, তার মূল কথাই হল সরকারের দায় হ্রাস করা এবং বাজার নির্ভরতা বৃদ্ধি। স্বভাবতই এক এক করে দায়মুক্ত হতে হতে অবশেষে ২০০৪ সালে কোপ পড়েছিল পেনশনে। সরকার পোষিত বিধিবদ্ধ সুনির্দিষ্ট পেনশনের পরিবর্তে প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য এবং পরবর্তীতে অধিকাংশ রাজ্যে চালু হল বাজার নির্ভর অনিশ্চিত পেনশন ব্যবস্থা। যদিও ব্যতিক্রম থেকে গেল পশ্চিমবাংলা। কারণ সংসদে আইন প্রণয়ন করে নয়া পেনশন ব্যবস্থা যখন চালু হয় তখন এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার পেনশনার্সদের স্বার্থবিরোধী এই নয়া ব্যবস্থা চালু করতে অস্বীকার করে।

পেনশন বেসরকারীকরণের মতোই একই কথা বলা যায়, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারীকরণ প্রসঙ্গেও। নব্বইয়ের দশকের আগে কর্মচারী আন্দোলনের দাবিসনদে, 'ব্যাঙ্ক, বীমা সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারীকরণ ও বিলগ্নীকরণ বন্ধ কর' এমন দাবি খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ সেই একটাই। রাষ্ট্রের তরফে এই ধরনের কোনো পরিকল্পনাই ছিল না। এবার আমরা চোখ ফেরাতে পারি বহু চর্চিত মহার্ঘভাতার দিকে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তর দশকের একটা বড় সময়জুড়ে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দিতে হবে—এই দাবি নিয়ে বহু আন্দোলন হয়েছে। আবার এখনও হচ্ছে। মাঝের সময়টাতে, অর্থাৎ সত্তর দশকের শেষ পর্ব থেকে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকজুড়েও দাবিসনদে মহার্ঘভাতার দাবি থাকত। অথচ গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত পরিস্থিতির বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে। প্রশ্ন উঠতে পারে পরিস্থিতির অভ্যন্তরে একাধিকবার পরিবর্তন সত্ত্বেও মহার্ঘভাতার দাবিটি থেকে গেল কেন? তাহলে কি মহার্ঘভাতার দাবি পরিস্থিতি নিরপেক্ষ। না, তা নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বাইরে থেকে এই তিন পর্বের মহার্ঘভাতার দাবিকে একইরকম মনে হলেও, ভাষাগত তারতম্যের দিকে লক্ষ্য করলে পার্থক্যটা স্পষ্ট হবে। যেমন পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তর দশকের দাবি ছিল কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দিতে হবে। কারণ তখনও রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা এই দাবি অর্জন করেননি। ১৯৭৯ সালে বামফ্রন্ট সরকারের কাছ থেকে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দাবিটির স্বীকৃতি মিলল। ১৯৮০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যেও বিভিন্ন সময়ে দাবিসনদে মহার্ঘভাতার দাবিটি যুক্ত হয়েছে। কিন্তু তখন দাবির ভাষা ছিল—'বকেয়া মহার্ঘভাতা মিটিয়ে দিতে হবে' (যদিও কখনোই বকেয়া আজকের মতো পাহাড় প্রমাণ হয়নি)। ঐ তিন দশকে 'কেন্দ্রীয় হারে' এই শব্দবন্ধটি দাবিসনদে উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়নি। কারণ রাজ্য কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা কেন্দ্রীয় হারেই মহার্ঘভাতা পাবেন—এই স্বীকৃতি মিলেছিল বামফ্রন্ট সরকারের কাছ থেকেই। ২০১১ সালের পর থেকে মহার্ঘভাতার দাবিতে আবার ভাষাগত পরিবর্তন ঘটে গেল। বকেয়া সহ কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দিতে হবে—খুব জোরালোভাবেই এই দাবি উত্থাপন করতে হল। কারণ বর্তমান সরকার শুধু মহার্ঘভাতা বকেয়াই রাখছে তা নয়, কেন্দ্রীয় হারে প্রাপ্তির যে অর্জিত অধিকার তাকেও অস্বীকার করছে। স্বভাবতই দাবিসনদে নির্দিষ্ট দাবির অবস্থানগত ও ভাষাগত বিন্যাস নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবেই পরিস্থিতির ওপর। গণতন্ত্রের প্রসঙ্গটিও পরিস্থিতি অনুযায়ী দাবিসনদে যুক্ত হয়েছে। প্রাক্‌সাতাত্তর পশ্চিমবাংলায় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার দাবিটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭৭ থেকে ২০১১ এই দাবি উত্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ছিল না। ২০১১-র পরবর্তীতে পুনরায় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিটি ফিরে এসেছে।

অবশ্য কিছু দাবি রয়েছে যা রাষ্ট্র চরিত্রের কারণেই চিরকালীন। যেমন মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার দাবি, বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবি, গরিব মানুষের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দাবি, নারীদের সমানাধিকারের দাবি ইত্যাদি।

(দুই)

আগেই বলা হয়েছে 'কনটেন্ট'-এর মতোই আন্দোলনের ফর্মও পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। স্বাধীনতার পরেই ১৯৪৯ সালে রাজ্য কর্মচারীদের যৌথ প্রতিবাদের প্রক্রিয়াকে বন্ধ করার জন্য তৎকালীন সরকার ৯৭৫(এফ) সার্কুলার জারি করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ঔপনিবেশিক শাসনের লিগ্যাসি বহন করে রাজ্য প্রশাসনের অভ্যন্তরে যে দমবন্ধ করা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তাকে ভাঙার মতো শক্তি অর্জনের জন্যই, স্বাধীনতার বহু আগে থেকেই গড়ে ওঠা একাধিক সংগঠন স্বাধীনতার পরে জোটবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে। অর্থাৎ পরিস্থিতি তাদের বাধ্য করেছিল ঐ পথে এগোতে। সম্মিলিত ক্ষোভ যে সরকারের পক্ষে স্বস্তিদায়ক হবে না, তা আঁচ করেই ঐ কালা সার্কুলার জারি করা হয়েছিল।

কিন্তু যৌথ আন্দোলনের বিকাশকে থামানো যায়নি। যা সংহত রূপ পায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠনের মধ্য দিয়েই যৌথ আন্দোলনের বিকাশ থেমে যায়নি। পরিস্থিতিই আরও বিকশিত ও বিস্তৃততর যৌথ আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে ওঠার পথকে সুগম করে তুলেছিল। একদিকে শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষকদের যুক্ত আন্দোলন মঞ্চ ১২ই জুলাই কমিটি গঠিত হয়েছে। অপরদিকে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের কর্মচারী সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ হিসেবে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন গড়ে উঠেছে। এক কথায় এই রাজ্যের সরকারী কর্মচারী আন্দোলন শুরু থেকেই ছিল যৌথ আন্দোলনের পাঠশালা।

চূড়ান্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রমিক, কর্মচারী ও শিক্ষকদের যৌথ প্রতিরোধ শক্তিকে দৃশ্যমান করার জন্যই ১২ই জুলাই কমিটি গঠিত হয়। গত শতাব্দীর ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সত্তর দশকের বড় অংশ জুড়ে (জরুরি অবস্থা সহ) ১২ই জুলাই কমিটি যখন প্রতিরোধ গড়ে তুলছে, ঠিক একই সময়ে শ্রমজীবী মানুষের অপরাপর অংশ সহ পশ্চিমবাংলার গণ আন্দোলনও দুর্বার গতিতে বিকশিত হয়েছিল। স্বভাবতই সংগ্রাম আন্দোলনের চুম্বকীয় আকর্ষণে পরস্পরের কাছে আসা এবং ১২ই জুলাই কমিটির গণআন্দোলনের শরিক হওয়ার কাজ সম্পন্ন করেছিল। তার মানে, পরিস্থিতি শুধুমাত্র যৌথ আন্দোলনের বিকাশই ঘটালো না, সেই যৌথ আন্দোলনে রাজনৈতিক চেতনার সন্নিবেশ ঘটিয়ে তাকে জমাট করে তুলল।

১৯৭৭ সালে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিকূলতার অবসান ঘটে, গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। যে অধিকারগুলি অর্জনের জন্য স্বাধীনতা উত্তর দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে রাজ্যের অভ্যন্তরে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে, তার এক এক করে স্বীকৃতি মিলতে থাকে। কিন্তু এটা ছিল একটা দিক। কারণ ১২ই জুলাই কমিটি তার গঠন কাঠামো অনুযায়ী শুরু থেকেই দ্বিমুখী আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করেছে। এর মধ্যে একটি হল রাজ্য সরকারের জনস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অপরটি কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় স্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠার পরবর্তী পর্বে রাজ্য সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। কারণ এই সরকার জনস্বার্থ বিরোধী কোনো নীতি গ্রহণ করেনি। স্বভাবতই ১২ই জুলাই কমিটি তার সমস্ত সাংগঠনিক শক্তিকে সংহত করে কেন্দ্রে বিভিন্ন সময়ে নির্বাচিত সরকার সমূহের দেশ ও দশের স্বার্থবিরোধী নীতিসমূহের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। গণআন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ যে রাজনৈতিক চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল, তার বলে বলীয়ান হয়েই রাজ্য সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরাও কিন্তু কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকে। এই অংশ কিন্তু শুধুমাত্র নিজস্বার্থের ঘেরাটোপে আবদ্ধ থাকেনি। অর্থাৎ সুদৃঢ় রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন যৌথ আন্দোলন, যা কোনো এক বিশেষ পরিস্থিতির ফসল হলেও, পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাযুজ্য রেখে নিজ কার্যকারিতা শুধু বজায় রাখা নয়, তাকে বৃদ্ধিও করতে পারে। দীর্ঘ ৩৪ বছরের অনুকূল বাস্তবতাতেও তাই ১২ই জুলাই কমিটির সংগঠনের ধার এতটুকুও ভোঁতা হয়নি।

যৌথ আন্দোলনের শক্তিশালী হওয়ার আরও একটি আবশ্যিক শর্ত হল, অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলিরও শক্তিশালী হয়ে ওঠা। অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলিতে দুর্বলতা দেখা দিলে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে যৌথ আন্দোলনেও। এই নিরিখে ১২ই জুলাই কমিটির শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণই হল অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলির সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া।

তবে এই পর্বে আত্মসমালোচনার একেবারেই যে কিছু ছিল না, তা নয়। লড়াই আন্দোলনের দীর্ঘ ঐতিহ্য বহনকারী একক সংগঠন ও যৌথ মঞ্চ উভয়তই দুটি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এর মধ্যে একটি সমস্যা 'সাবজেকটিভ' অপর সমস্যাটি 'অবজেকটিভ'। সাবজেকটিভ সমস্যাটি হল নয়া উদারবাদী দর্শনের নির্দেশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরগুলিতে বহুদিন ধরেই এবং রাজ্যের সরকারী দপ্তর ও বিদ্যালয়ে ২০১১ সালের পর স্থায়ী নিয়োগ কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, সব সংগঠনেরই সদস্য সংখ্যা হ্রাস পেতে। এর ফলে সংগঠন কাঠামোর নিয়মিত মসৃণ পুনর্নবীকরণ প্রক্রিয়াটিও বাধাপ্রাপ্ত হয়। 'অবজেকটিভ' সমস্যাটি হল বিশ্বায়নজনিত ভোগবাদের ব্যাপক প্রভাব। যা মধ্যবিত্ত মানসে সংগ্রাম-আন্দোলন বিমুখতা ও আত্মকেন্দ্রীকরণ জন্ম দেয়।

অনুকূল বাস্তবতায় এই সমস্যাগুলি যে চিহ্নিত হয়নি তা নয়, হয়েছে, কিন্তু এর নেতিবাচক প্রভাবটি উপলব্ধি করা অথবা উপলব্ধি করা গেলেও, এমনও হতে পারে। অনুকূল পরিস্থিতিতে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকায়, প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। করা গেল যখন পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি আবারও প্রতিকূল হয়ে উঠল। নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকার কারণেই প্রত্যেকটি একক সংগঠনের কমবেশি সংখ্যাগত হ্রাস ঘটেছে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য সম্মিলিত হওয়ার, অর্থাৎ যৌথ আন্দোলনের নতুন বাস্তবতা তৈরি হল। কিন্তু অতীতের তুলনায় প্রতিকূলতা বহুমাত্রিক। ষাট বা সত্তর দশকের মতো শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিকূলতা নয়। তার সাথে যুক্ত হয়েছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিকূলতাও।

তাই যৌথ আন্দোলনের ক্ষেত্রেও পরিচিত ঘরানার বাইরে বেরিরে আরও প্রসারিত যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার সহনশীল প্রক্রিয়া গ্রহণ করা প্রয়োজন। অতীত অভিজ্ঞতার কপি পেস্ট করে যার সবটা ব্যাখ্যা করা যাবে না। বর্তমান সময়ে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য অতীতের তুলনায় অনেক বেশি 'ট্রায়াল এন্ড এরর' পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটাতে হবে। কারণ সমমনোভাবাপন্ন সংগঠন সমূহের যৌথ আন্দোলনের গণ্ডীর বাইরেও প্রয়োজনে পা ফেলতে হতে পারে। এই কাজে সাহস, দায়বদ্ধতার প্রয়োজন অতীতেও ছিল, আজও আছে। কিন্তু আজ আরও একটি বিষয় খুব বেশি প্রয়োজন তা হল ধৈর্য। বীজগণিতের মতো ফর্মুলা প্রয়োগ করে চটজলদি সঠিক উত্তর সবক্ষেত্রে নাও পাওয়া যেতে পারে। বরং এই সময়ে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার কাজটা অনেকটা এক হাতে পেন্সিল, এক হাতে ইরেসর নিয়ে ছবি আঁকার মতো। পেন্সিলের দাগ নির্দিষ্ট রেখার বাইরে গেলে ইরেসর দিয়ে মুছে বার বার ঠিক করে নেওয়া। ধৈর্য নিয়ে এই কাজটা করতে পারলে একটা সময় যৌথ আন্দোলনের সঠিক ও কার্যকরী পোর্ট্রেট তৈরি হবেই। □

সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
সহযোগী সম্পাদক ঃ সুমন কান্তি নাগ
যোগাযোগ ঃ
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত এবং সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭২ হইতে মুদ্রিত।